শ্রেষ্ঠ গল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদনা ও সংকলন

সজল আহমেদ

শ্রেষ্ঠ গল্প
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদনা ও সংকলন : সজল আহমেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০২৩

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৪৭৫ টাকা

Shrestha Golpo by Narayan Gangopadhyay edited by Sajal Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Second Edition: May 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 475 Taka RS: 475 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-91734-0-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরাগীদের উদ্দেশে

ভূমিকা

মানুষের জীবন বড় অদ্ভুত। আর এই জীবনের গল্পগুলো আরো অদ্ভুত। অনেক স্বপ্ন, অনেক রঙ, পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব সবই মিলেমিশে তৈরি হয় জীবনের বহুমাত্রিক গল্পগুলো। সেখানে বাস্তবতা রূঢ় সত্যেরই প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের একজন অবিকল্প গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সমাজচেতনার শৈল্পিক রূপকার। আমাদের সমাজের চারপাশে মানুষের প্রতিদিনের স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের নির্মম বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে। প্রত্যেকটি গল্পই জীবন কেন্দ্রিক। পড়তে পড়তে কখনো চোখ ভিজে ওঠে, কখনো হারিয়ে যাই শৈশবের উঠানে, কখনো শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ।

তাঁর গল্প নির্মাণের অভিভূত কৌশল, শব্দ চয়ন, শিল্পসত্তা সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করে। এক মায়াময় অথচ নির্মম বাস্তবতার কুয়াশার চাদরে ঢাকা তাঁর গল্পের বিস্ময় জগৎ। মানুষ ও সমাজের অস্তিত্ব হারানোর দ্বৈত-সংকট প্রকটভাবে তুলে ধরেন প্রতিটি গল্পে। বাস্তবতার অকৃত্রিম রঙের ছোঁয়া তাঁর প্রতিটি গল্পের শৈল্পিক সৌন্দর্যকে নিয়ে যায় এক অন্যমাত্রায়। বাংলাসাহিত্যে বিরল প্রতিভার অধিকারী তিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাদু পাঠযোগ্যতা, ভাষার মাধুর্য, সমাজচেতনা ও পরিবেশ পাঠককে সর্বদা মোহগ্রস্ত করে রাখে।

বাঙালির জীবনে আর কিছুই না থাকুক, শুরু থেকে যে গল্প ছিল, তা বার বার প্রমাণ করেন কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পরিচিত ও অপিরিচিত মোট সতেরোটি নির্বাচিত গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো *শ্রেষ্ঠ গল্প* সংকলনটি। পাঠকের ভালো লাগলে আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত সম্পাদক

সূচিপত্র

টোপ	১১
হাড়	২৬
ইতিহাস	৩৪
বীতংস	৪৮
বনতুলসী	৬০
উস্তাদ মেহেরা খাঁ	৬৯
কনে-দেখা আলো	৮৫
নক্র চরিত	৯৬
দুঃশাসন	১০৯
ফলশ্রুতি	১১৭
একটি শক্রর কাহিনি	১২৬
জান্তব	১৪২
বন-জ্যোৎস্না	১৫১
পুষ্করা	১৬৬
দুর্ঘটনা	১৭৪
ভাঙা-চশমা	১৮৫
দোসর	১৯৩
পরিশিষ্ট-১	
কী করে লেখক হলাম	২০৭
পরিশিষ্ট-২	
জীবনপঞ্জি	২১৩

টোপ

সকালে একটা পার্সেল এসে পৌঁছেছে। খুলে দেখি একজোড়া জুতো।

না, শত্রুপক্ষের কাজ নয়। একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউ। চমৎকার ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি।

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথায় অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব ক'টাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক আছে বলেও জানি না। তাহলে ব্যাপারটা কি?

খুব আশ্চর্য হব কিনা ভাবছি, এমন সময়, একটা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়ল। উইথ্ বেস্ট্ কমপ্লিমেন্টস্ অব রাজাবাহাদুর এন, আর চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট।

আর তখনি মনে পড়ে গেল! মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকার কাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলো যতদূর মনে হয়, আমার এক সহপাঠী তার এস্টেটে চাকরি করত। তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটা কাব্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস চুরি করে যে প্রশান্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম ঃ

ত্রিভুবন প্রভা কর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতিদমন ওহে তুমি নিরুপম।

কাব্যচর্চার ফলাফল হলো একেবারে নগদ নগদ। পড়েছি—আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খানখানান হিন্দি কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। দেখলাম সে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণবান মহীয়ান অরাতিদমন মহারাজ এখনো বজায় রেখেছেন। আমার মতো দীনাতিদীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে

লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্যে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

রাজাবাহাদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক গায়ে জ্বালা, আমার সৌভাগ্য ওদের ঈর্ষা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকো বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড় ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তার সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন, তখন তা আমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়া গেল। তাছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকে মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জঙ্গলের ভেতর ছোট একটা রেললাইন আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামল।

নামবার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী তকমা আঁটা ঝকঝকে পোশাক পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বললে—হুজুর, চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি—যার পুরো নাম রোল্‌স্ রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'। তা 'রোজ'ই বটে। মাটিতে চলল, না রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে্ গদি নয়, লাল মখমলের কুশন্ হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথার সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়—সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নিচে মাটির ঢেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক—আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হলো একবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার, চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ক্রমশ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে! পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ন ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। 'রোজে'র

নিঃশব্দ চাকার নিচে মর্মর করে সাড়া তুলছে শুকনো শালের পাতা বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝড়ে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। দু'পাশে নিবিড় শালের বন, কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতে চায়। এইসব প্লটে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপণ করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করেছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাক বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে—

তা হলে পকেটের ফাউন্টেন পেনটা ছাড়া আর কোন অস্ত্রই সঙ্গে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—হাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

—হাঁ, হুজুর।

—ভালুক?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুরই উত্তর। ওরা বলল—হাঁ হুজুর।

—অজগর সাপ?

—জী মালিক।

প্রশ্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্ত এসে থেমে গেল আমার। সে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্রশ্নই যে 'না' বলে আমাকে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পয়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানে। জুলু কিংবা ফিলিপিনোরাও এখানে বিষাক্ত ব্যুমেরাং বাগিয়ে আছে কিনা এবং মানুষ পেলে তারা বেগুনপোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এ জাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস্ ঘস্ করে ব্রেক করল একটা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম—কিরে, বাঘ নাকি!

আর্দালিরা মুচকি হাসল—না হুজুর, এসে পড়েছি।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। পথের বাঁ দিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমি; সেখানে কাঠের তৈরি বাংলো প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়ি। এই নিবিড় জঙ্গলের ভেতর যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিন জন চাপরাশি বেরিয়ে এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটা গড়খাই কাটা। লোকগুলো ধরাধরি করে মস্তবড় একফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিল। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন, আর চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনে।

আরে, আরে কী সৌভাগ্য! রাজাবাহাদুর যে স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন আমার অপেক্ষায়। একগাল হেসে বললেন, আসুন আসুন, আপনার জন্য আমি এখনো চা পর্যন্ত খাইনি।

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগাল।

রাজাবাহাদুর বললেন—এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি!

বড় আনন্দ হলো, ভারি আনন্দ হলো। চলুন চলুন ওপরে চলুন।

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়! একেই বলে রাজোচিত বিনয়।

রাজাবাহাদুর বললেন—আগে স্নান করে রিফ্রেশ্‌ড হয়ে আসুন, টি আই গেটিং রেডি। বোয়, সাহাবকো গোসলখানামে লে যাও।

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহে বাঙালি; তবু হিন্দি করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটাই রাজকীয় দস্তুর। বয় আমাকে গোসলখানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজন! এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্নান করিনি। ব্রাকেটে তিন চারখানা, সদ্য পাট ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ কেসে তিন রকমের নতুন সাবান, ব্রাকে দামী দামী তেল, লাইমজুস। অতিকায় বাথ্‌টাব্—ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার—কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল নয়।

স্নান হয়ে গেল। ব্রাকেটে দোপদূরস্ত ফরাসডাঙায় ধুতি, সিল্‌কের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হলো, তাই পরে নিলাম।

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে।

ড্রেসিংরুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজাবাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চুরুট খাচ্ছিলেন। বললেন, আসুন চা তৈরি।

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালো। চা, কফি, কোকো, ওভ্যালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠাণ্ডা মাংস। কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিলে চললাম আমি। রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো রুটি খেলেন, কখনো একটা ফল। অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পরপর কাপ তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন।

দেখলাম। প্রকৃতির এমন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি। ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুসে শূন্যতার ওপরে। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে পাহাড়ি নদীর একটা সংকীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

আমার মুখ দিয়ে বেরুল—চমৎকার।

রাজাবাহাদুর বললেন—রাইট্। আপনারা কবি মানুষ, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই। কিন্তু নিচের এই যে জঙ্গলটি দেখতে পাচ্ছেন, ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান অব দি ফরেস্টস। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।

আমি সভয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট! কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চারশো ফুট নিচে ওই অতিকায় জঙ্গলটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি—পাহাড়টা যেন গাঢ় নীল রং দিয়ে আঁকা। মনে হয় ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ—

আমি বললাম—ওখানেই শিকার করবেন নাকি?

—ক্ষেপেছেন, নামব কী করে। দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারির বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।

—মাছ ধরেন!—আমি হাঁ করলাম ঃ মাছ ধরেন কি রকম? ওই নদী থেকে নাকি?

—সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন—রাজাবাহাদুর রহস্যময়ভাবে মুখ টিপে হাসলেন ঃ আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাঙ্গামা।

—কিছু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না, শুধু হাসলেন তারপর ম্যানিলা চুরুটের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন—আপনি রাইফেল ছুড়তে জানেন?

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম আমি, এর পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে না, শোভনও নয়। সেটা কোর্ট-ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন—রাইফেল ছুড়তে পারেন?

বললাম—ছেলেবেলায় এয়ারগান ছুড়েছি।

রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন—তা বটে। আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় না। আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম—এ শুধু লাউঞ্জ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। খাওয়ার টেবিলেই নিমগ্ন ছিলাম বলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

চারদিকে সারি সারি নানা আকারের অগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারা। একটা হুকের সঙ্গে খাপে আঁটা একজোড়া রিভলভার ঝুলছে, তার পাশেই দুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তলোয়ার—সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙ। মোটা চামড়ার বেল্টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ—রাইফেলের, রিভলভারের। জরিদার খাপে খানতিনেক নেপালী ভোজালি। আর দেয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকম চামড়া—চাঘের, সাপের, হরিণের, গো সাপের! একটা টেবিলে অতিকায় হাতির মাথা—দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম—এরা রাজাবাহাদুরের বীর কীর্তির নিদর্শন।

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন—এটা লাইট জিনিস। তবে ভালো রিপিটার; অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারেন।

আমার কাছে অবশ্য সবই সমান। লাইট রিপিটার যা, হাউইট-জার কামানও তাই; তবু সৌজন্য রক্ষার জন্যে বলতে হলো—বাঃ তবে তো চমৎকার জিনিস।

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে ঃ তা হলে চেষ্টা করুন। লোড করাই আছে, ছুড়ুন ওই জানালা দিয়ে।

আমি সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলাম! জীবনে বেকুবি অনেক করেছি, কিন্তু তার পরিমাণটা বাড়াতে আর প্রস্তুত নই। যুদ্ধ-ফেরত এক বন্ধুর মুখে তার রাইফেল ছোড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম—পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে একমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে যতদূর জানি—আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম—ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়।

রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন, এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন না। হাতে থাকলে বুঝবেন কতবড় শক্তিমান আপনি। ইউ ক্যান ইজিলি ফেস অল দ্য রাস্কেলস অব—অব—